উপসংহার

অমিয়ভূষণ মজুমদার বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথা সাহিত্যের একজন অন্যতম কথাসাহিত্যিক। সমকালীন সময়ের প্রচলিত স্রোতে গা না ভাসিয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাস নিয়ে তিনি নিরন্তর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এরফলে তাঁর প্রতিটি উপন্যাস হয়ে ওঠেছে স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির কথাবস্তু ও সংস্থানভূমির অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে রচিত তাঁর উপন্যাসগুলির অবদান কোনো অংশে কম নয়। বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে অমিয়ভূষণের কয়েকটি উপন্যাসের পটভূমি নিয়ে আলোচনায় দেখেছি ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রকৃত অর্থেই বাংলা উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের পটভূমিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আগে বাংলা উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ও সেই অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমাজের কথা এমন নিখুঁতভাবে খুব কমই চিত্রিত হয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর 'দুখিয়ার কুঠি', 'মহিষকুড়ার উপকথা', 'মধু সাধুখাঁ', 'বিনদনি', 'মাকচক হরিণ', 'হলং মানসাই উপকথা', 'সোঁদাল' প্রভৃতি উপন্যাসের পটভূমিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী, অরণ্য, জনপদগুলির বাস্তব সম্মত চিত্র তুলে ধরেছেন। ফলে উপন্যাসগুলির পটভূমি যে উত্তরবঙ্গ সে বিষয়ে আমাদের মনে আর কোনো সংশয় থাকে না। উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসগুলিতে অমিয়ভূষণ উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠীর মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তৈরি হওয়া সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের কৌমজীবন অবলম্বনে রচিত উক্ত উপন্যাসগুলি বাংলা কথাসাহিত্যে অমিয়ভূষণের সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। কাহিনি বিন্যাসের গতানুগতিকতা থেকে বেড়িয়ে তিনি তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে চরিত্রদের ভাবনায় কাহিনিধারাকে বিন্যস্ত করেছেন। চরিত্রদের ভাবনার মাধ্যমেই তিনি আসাম সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠী, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নেমে আসা সংকটকে রূপ দিয়েছেন। চরিত্রদের স্মৃতি চারণার মাধ্যমে তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কৌম জনসমাজের অতীত ইতিহাসকেও তুলে ধরেছেন।

অমিয়ভূষণের প্রিয় ভূমি উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গে বসেই নিরলসভাবে আজীবন তাঁর সাহিত্যসাধনা। তাঁর রচিত সাহিত্য বাণিজ্যসফল নয় বলে মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। প্রাতিষ্ঠানিক

নামি পত্রিকা অপেক্ষা লিটল ম্যাগাজিনে নিজের লেখা প্রকাশে তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন। কেননা, অমিয়ভূষণ মনে করেন সাহিত্য সৃষ্টি হল আধুনিক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায়। এজন্য তাঁর সাহিত্যরচনায় পাঠকের মনোরঞ্জন প্রাধান্য পায়নি। তিনি মনে করতেন—

> ''সত্য, কল্যাণ, সুন্দর প্রভৃতি যেন সাহিত্যিকের হাতে ধরা তুলির রং, কতটুকু কার প্রয়োগ হলে সাহিত্য তাঁর মনের মতো হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য-ভাবনা বিমূর্ত হয়ে ওঠে এ তিনিই জানেন। আমরা শুধু সম্পূর্ণটাকে দেখে মোহিত হতে পারি।''[১]

সাহিত্য সৃজনে এই ভাবনা তাঁর সাহিত্যকে নিজস্বতা দান করেছে। পাঠকের কথা ভেবে তিনি সেই নিজস্বতা থেকে কোনোদিনই বেড়িয়ে আসেননি। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার শহরে অমিয়ভূষণের বাস। অত্যন্ত কাছে থেকে তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পাহাড়, নদী ও অরণ্যপ্রকৃতিকে দেখেছেন। সেইসব অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কেও জেনেছিলেন তিনি। উত্তরবঙ্গের মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অরণ্যময় অঞ্চলে বসবাসকারী কৃষিজীবী কোচ, রাজবংশী, রাভা সম্প্রদায়ের মানুষকে অমিয়ভূষণ যেভাবে দেখেছেন উপন্যাসে তিনি হুবহু সেভাবে তুলে ধরেননি। শিল্পের দাবি মেনেই তিনি বাস্তব ও কল্পনার অপূর্ব সংমিশ্রণে উপন্যাসের পটভূমি এবং চরিত্রগুলিকে রূপ দিয়েছেন। কখনো ঔপন্যাসিক স্বয়ং আবার কখনো চরিত্রদের অতীত স্মৃতিচারণার মাধ্যমে উপন্যাসের কথাবস্তুতে কৌম জনগোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস, তাদের সমাজ, সংস্কার, প্রচলিত রীতি-নীতির পরিচয় দিয়েছেন। 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে দুখজাগানিয়া কুঠির নামকরণ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক স্বয়ং উক্ত অঞ্চল ও সেখানে বসবাসকারী আদিবাসীদের অতীত ইতিহাস ও তাদের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপকে বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরেছেন। অনুরূপভাবে 'বিনদনি' ও 'মাচক হরিণ' উপন্যাসেও তল্লিগুড়ির পরিচয় প্রসঙ্গে তল্লিগুড়ির অতীত ইতিহাস, রায়ডাক নদীর গতিপথের বর্ণনার মাধ্যমে আরণ্যক উত্তরবঙ্গের বিশেষ আঞ্চলিক রূপের ছবি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে উল্লেখিত তুরুককাটা, হাদলামারি, হাতকাটা, লাউতামা প্রভৃতি অঞ্চলের নামকরণের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের স্থানীয় অতীত ইতিহাসের আভাস দিয়েছেন অমিয়ভূষণ। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার অভিঘাত উত্তরবঙ্গের ছোট ছোট গ্রামজনপদের মধ্যেও কীভাবে আছড়ে পড়েছিল এগুলি তারই আভাস। 'হলং মানসাই উপকথা' এবং 'সোঁদাল' উপন্যাসে এরকম উত্তরবঙ্গে সংঘটিত নকশাল আন্দোলনের

প্রসঙ্গ পাই। মোদনাথ, সুহাস, সুপ্রিয়, সুবল, রতন, শ্যামল-রা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে নকশাল আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। অমিয়ভূষণ দেখিয়েছেন ছিন্নমূল লেদু মিঞার মতো অশিক্ষিত কৃষকও সেসময় কেমন করে জমি পাবার আশায় গুপ্তভাবে জোতদার হত্যায় মেতে উঠেছিল। সমকালীন উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত যুবকেরা কীভাবে ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে শ্রেণীসংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে সমরেশ মজুমদার তাঁর 'কালবেলা' উপন্যাসে সেই বিশ্বস্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। অমিয়ভূষণের উপন্যাসগুলিকে উত্তরবঙ্গের কৌম সমাজজীবনের বিশ্বস্ত দলিল বলা যেতে পারে। কেননা, অমিয়ভূষণ তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে উত্তরবঙ্গের কৃষিনির্ভর কৌম সমাজজীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত তিনি রাভাদের ধান উৎপাদন পদ্ধতির কথা তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ধান উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে রাভাদের সমাজ জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের লোভের কাছে অরণ্য কীভাবে হার মানতে বাধ্য হয়, জোতদার জাফরুল্লা কৃষিকাজের জন্য কীভাবে অরণ্যের জমি অধিগ্রহণ করে তার জমির পরিমাণ বাড়ায়। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমকালীন উত্তরবঙ্গের ছিন্নমূল মানুষের অসহায়তাকে আসফাকের করুণ অবস্থার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি। উত্তরবঙ্গের জোতদার, মহাজনদের দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনার ফলে প্রান্তিক চাষি এবং ভূমিহীন কৃষকদের পঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশকে আসফাকের নীরব প্রতিবাদের মাধ্যমে অমিয়ভূষণ ভাষারূপ দিয়েছেন। আমরা দেখেছি কীভাবে জাফরুল্লা ব্যাপারির সর্বগ্রাসী ক্ষমতা আসফাকের প্রেমিকাকেও কেড়ে নিয়েছে। প্রেমিকা কমরুন নতুন করে দল তৈরির স্বপ্ন দেখালেও আসফাক নিরুপায়, কেননা পালিয়ে বেড়ানোর মতো অরণ্য আর নেই, এখন সব বনই কারো না কারো মালিকাধীন।

'বিনদনি', 'মাকচক হরিণ', 'হলং মানসাই উপকথা', 'সোঁদাল' প্রভৃতি উপন্যাসেও তিনি বিভিন্ন চরিত্রের কথায় অরণ্যধ্বংসের ছবি তুলে ধরেছেন। 'বিনদনি' ও 'মাকচক হরিণ' উপন্যাসে জনাদন, বোমভোলা, লজু ও শ্যামচাঁদের ভাবনায় মাতৃতান্ত্রিক রাভাসমাজে প্রচলিত জমির উত্তরাধিকার ও তাদের বিভিন্ন রীতি-নীতির কথা জানতে পারি। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাভাদের এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অবলুপ্ত। রাভা লোকসমাজে প্রচলিত রাইন্তক পূজা, গোত্র বিভাজন, কিলাংনানি প্রথা, চিকাবাইরাই প্রভৃতিও আজ অবলুপ্ত। উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের অতীত স্মৃতি চারণার মাধ্যমে তাঁদের সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কারের কথা জানতে পারি। রাভাদের বিভিন্ন গোত্র, যেমন— কামাং, হাইসুগ, কান্ত্রাং প্রভৃতি। রাভারা তাদের গোত্র সব সময়

মায়ের কাছ থেকে পায়। মায়ের গোত্রই সন্তান-সন্ততিদের গোত্র। ফলে কোনো রাভা নারী ধর্মান্তরিত হলেও তার সন্তান সন্ততিদের মধ্যে মায়ের গোত্র রয়ে যায়। রাভা সমাজে একসময় এই গোত্র সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। কেননা, রাভা সমাজে একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। গোত্র সমস্যার কারণে অনেক রাভা পুরুষ আসামে চলে গেছে। আবার অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। 'মাকচক হরিণ' উপন্যাসে দেখা যায়, বমভোলার বাবা যদু এবং তার মায়ের একই গোত্র ছিল। ফলে রাভা সমাজের রীতি মেনে তাঁদের বিবাহ সম্ভব ছিল না। তখন যদু তাঁর ভালোবাসার পাত্রীকে বিবাহ করার জন্যই বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কেননা, ইসলাম ধর্মে গোত্র মানা হয় না। রাভা সমাজে প্রচলিত 'কিলাংনানি' নামক সামাজিক প্রথায় শাশুড়ি তাঁর জমি, গৃহ রক্ষার্থে জামাইকে বিবাহ করতে পারে। 'মাকচক হরিণ' উপন্যাসে দেখি, প্রদ্যুম্ন সাহেবের মা বিদুনবালা তার চেয়ে বয়সে ছোট জামাইকে বিবাহ করেছিল। মা বিদুনবালার এই অতীত ঘটনা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত সন্তান প্রদ্যুম্নের কাছে একই সঙ্গে লজ্জাজনক এবং ঘৃণ্যর বলে মনে হয়েছে। আবার 'বিনদনি' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ এর বিপরীত চিত্র তুলে ধরেছেন জনু চরিত্রের মাধ্যমে। স্ত্রী হারা জনু ওরফে জনাদন ধর্মান্তরিত হলেও নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাকে বিসর্জন দিতে পারেনি। আর তাই সে শাশুড়ি বিনদনির কাছে জমি রক্ষার জন্য ফিরে এসেছে। শাশুড়ি বিনদনি কাছে 'কিলাংনানি' প্রথায় আশ্রয় পাওয়ার জন্য সে মিনতি জানিয়েছে। রাভা নারীর জমি রক্ষা করা রাভা পুরুষের কর্তব্য। এটা রাভাদের সমাজে একটি স্বীকৃত সংস্কার। অথচ আধুনিক শিক্ষিত প্রজন্মের কাছে এই কিলাংনানি প্রথা ঘৃণ্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এভাবেই অমিয়ভূষণ রাভা সমাজে পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাভা জনজাতির মানুষেরা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর তাদের আত্মা যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে যায়। তাই মৃত্যুর পর তাদের কানে কানে চিকাবাইরাই বলে দেওয়া হয়, যাতে মৃত আত্মা তার পূর্বের ঠিকানায় পৌঁছে যেতে পারে। মুমূর্ষের কানে কানে বলা এই মন্ত্রই হল চিকাবাইরাই। চিকাবাইরাই'র মাধ্যমে মৃতের আত্মার সদ্‌গতি নির্দেশ করা হয়। একমাত্র নারীরাই জানতে পারে এই চিকাবাইরাই। তাঁদের বিশ্বাস ধর্মান্তরিত হলেও চিকাবাইরাই থেকে যায়। আর এ জন্যই ধর্মান্তরিত বমভোলা লজুকে জিজ্ঞাসা করে সে তার চিকাবাইরাই জানে কি না? আবার সামতিনি তাঁর প্রেমিক সামাথকে চিঠি লিখে পাঠায় সেই চিকাবাইরাই। উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী রাভা লোকসমাজে প্রচলিত এই সমস্ত বিশ্বাস, সংস্কার তাদের জীবনের কতটা গভীরে প্রোথিত তা অমিয়ভূষণের এই সমস্ত উপন্যাস না পড়লে জানা যায় না।

'দুখিয়ার কুঠি' ও 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে তিনি ক্রমবর্ধমান আধুনিক যান্ত্রিক নগর সভ্যতার কাছে উত্তরবঙ্গের কৌম জনগোষ্ঠীর মানুষের অসহায় পরাজয়ের কথা রূপ দিয়েছেন। সমসাময়িক সময়ে দাঁড়িয়ে অমিয়ভূষণ উত্তরবঙ্গের স্থানীয় আদিম জনগোষ্ঠী ও বহিরাগতদের মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দূরত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধিকে তিনি তাঁর 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে বাস্তবধর্মী করে রূপ দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে চরিত্রদের চিন্তা ও অনুভবে উত্তরবঙ্গের অবলুপ্তপ্রায় অরণ্য ও অরণ্যক প্রকৃতির কথা তুলে ধরেছেন। চরিত্রদের ভাবনায় বা অতীত স্মৃতিতে আদিম অরণ্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অরণ্যচারী এই সকল মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অরণ্য কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা অমিয়ভূষণের উপন্যাস পড়লে সহজেই অনুমান করা যায়। শুধু তাই নয় তাঁর বর্ণনাশক্তির অসামান্যতায় কোনো কোনো উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের নদী, অরণ্য প্রভৃতি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছে। যেমন, 'সোঁদাল' উপন্যাসে অমিয়ভূষণ অসাধারণ কবিত্বময় ভাষায় অরণ্যের সজীব সত্তার বর্ণনা করেছেন। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনা-নৈপুণ্যে অরণ্য ও মেঘ যেন ক্রীড়মান সজীব কোনো সত্তা—

> ''আমাদের চিন্তাভাবনা দর্শন কিছুকেই সে অরণ্য আমল দেয় না। বরং কিছু সময় থাকলে এরকম মনে হতে পারত, সে কিছু না বলেই জানিয়ে দিচ্ছে: তোমাদের এক রাজচ্যুত রাজাকে তার সৈন্যসামন্ত সমেত আশ্রয় দিয়েছিলাম। অন্য কোনো সময়ে এরকমও মনে হতে পারত, কালচে সবুজ মনসুন মেঘই যেন গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে কৌতুকে নেমে পড়েছে। আরো উঁচু থেকে নামা মনসুনেরই আর এক মেঘের নীল, কালচে নীল কুণ্ডলীগুলো নেমে নেমে অরণ্যের অতিথি হলেই বুঝতে পারা যেত, তারা একই জাত। দুজনে মিলে জল নিয়ে খেলতে খেলতে গ্রাম-গঞ্জ নদী-নালাকে ভাসিয়ে দেবে। গ্রামগুলোর গায়ে এসে পড়বে খেলার মাতামাতিতে। খেলা শেষ হলে মেঘগুলো উঁচু হতে হতে উদাসীন আকাশে মিলিয়ে গেলে, বনানীও গ্রাম থেকে দূরে সরে উদাসীন ভঙ্গীতে আবার ভাবতে থাকবে, হয়তো গর্ভের কথা।''[২]

উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে তিনিই প্রথম আসাম সংলগ্ন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অঞ্চলের অবহেলিত অরণ্যচারী কোচ, রাভা, রাজবংশী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষকে তাঁর উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। এদের মধ্যে ধর্মান্তরিত মুসলিম রাভা এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ও

রয়েছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন। রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষের নৃতাত্ত্বিক সংকটকে তিনি ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের পর্বসূত্র রচনার মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন, বাংলা কথাসাহিত্যে তা নিঃসন্দেহে অভিনব। শুধু তাই নয় উত্তরবঙ্গের অরণ্যের কোলে বসবাসকারী রাভাদের জীবনের সামগ্রিক সংকটকে চিত্রিত করতে গিয়ে তিনি একদিকে যেমন চরিত্রগুলির স্মৃতিচারণা থেকে তাঁদের পূর্বতন সামাজিক বিশ্বাস, সংস্কার, রীতি-নীতি ও খাদ্যাভাসের পরিচয় তুলে ধরেছেন, তেমনি অপরদিকে পরিবর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে তাদের জীবনের সংকটকেও রূপ দিয়েছেন। অমিয়ভূষণ মনে করেন রাভাদের অস্তিত্ব সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হল রাভা ভাষার অবলুপ্তি। কেননা, ভাষা যেকোন জাতির সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধারণ করে থাকে। নিজস্ব ভাষা ছাড়া কোন জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়না। অমিয়ভূষণ চরিত্রদের সংলাপের মাধ্যমে রাভা ভাষার ওপর স্থানীয় রাজবংশী, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার প্রভাবের কথা বলেছেন। এই সমস্ত ভাষার চাপে রাভা ভাষা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে পুরোপুরি। নতুন প্রজন্মের রাভা ছেলেমেয়েরা প্রবীণদের কাছে শোনা রাভা ভাষার দু-একটি শব্দ জানে মাত্র, তার বেশি কিছু জানে না। ফলে দুদিয়ার মতো প্রবীণ ব্যক্তিরা এখন মাতৃভাষায় ভাব বিনিময় করার জন্য রাভা ভাষা জানে এরকম কাউকে খুঁজে পায় না। ফলে তারা ধীরে ধীরে নীরব থাকাকেই যেন অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। আধুনিক নগরসভ্যতার ক্রমবিকাশ অরণ্যের কোলে বসবাসকারী রাভাদের অস্তিত্বের অবলুপ্তির জন্য দায়ী। সভ্যতাবিলাসী মানুষের সর্বগ্রাসী চাহিদার কাছে অরণ্য নিরুপায়। যথেচ্ছভাবে অরণ্য থেকে গাছ কাটার ফলে অরণ্য ক্রমশ বেআব্রু হয়ে পড়ছে। তিন্নির মতো আরণ্যক রাভা নারীরা বাধ্য হয়ে অরণ্যচ্যুত হয়ে লোকালয়ে আশ্রয় খোঁজে। তারা জীবনধারণের জন্য বাধ্য হয় গণিকাবৃত্তি গ্রহণে। নির্মম এই সত্যকে অমিয়ভূষণ উপন্যাসে বাস্তবসম্মতভাবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বহিরাগত বিশেষ করে ওপার বাংলা থেকে আসা প্রচুর মানুষ উত্তরবঙ্গের এই সমস্ত অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। ফলে উত্তরবঙ্গের অরণ্যাঞ্চলগুলি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাভাদের অরণ্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতিও হারিয়ে যেতে থাকে। অমিয়ভূষণ মজুমদার দেখিয়েছেন কীভাবে বহিরাগত এবং স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ধীরে ধীরে রাভাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে থাকে। তিনি আরও দেখিয়েছেন বর্গাদারী আইন প্রণয়নের ফলে রাভাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাদের সমস্যাকে কীভাবে আরও জটিল করে তুলেছে। নতুন এই আইন প্রবর্তনের

ফলে রাভাদের জমির সমস্যা আরও প্রকট হয়। এর ফলে রাভা পুরুষ ক্রমশ ভূমিহীন হতে থাকে এবং রাভা নারীর জমি রাভা পুরুষদের হাতছাড়া হতে শুরু করে। গোত্র সমস্যা উত্তরবঙ্গের রাভাদের সমাজজীবনে আরও সংকট ডেকে আনে। গোত্র সমস্যা থেকে রেহাই পেতে রাভারা কেউ কেউ হিন্দু, কেউবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অনেকে আবার গোত্রের খোঁজে আসামের অরণ্যে চলে যায়। 'উপন্যাসে বিধৃত উত্তরবঙ্গের পটভূমি' শীর্ষক উপ-অধ্যায়ে উক্ত উপন্যাসগুলির পটভূমি আলোচনায় রাভাদের সেই সমস্যার স্বরূপ জানতে পেরেছি। এছাড়াও উপন্যাসের আলোচনায় দেখেছি চরিত্রগুলির মানসিকতার ওপর উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত প্রভাব কতটা ক্রিয়াশীল। মাতালু, কাঁকরু, রংবর, ফুলবর, ফুলমতী, চাউটিয়া বর্মন, দুদিয়া, আসফাক, বমভোলা, শাতালু মিঞা প্রভৃতি চরিত্রগুলি উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে অমিয়ভূষণের অনন্যসৃষ্টি। চরিত্রগুলির কার্যকলাপ ও ভাবনায় উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনের ছাপ স্পষ্ট। অমিয়ভূষণ নিম্নবর্গীয় এই চরিত্রগুলির মানসিক প্রকৃতি, আচার, আচরণ ও কার্যকলাপকে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিকতার সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে দিয়েছেন যে অন্য যেকোনো পটভূমিতে চরিত্রগুলি বেমানান। অমিয়ভূষণের চরিত্র সৃষ্টির এই অনন্যতা সম্পর্কে সমালোচক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যথার্থ বলেছেন—

> ''আদিম, আপনাকে-না-জানা মানুষের অন্তরের অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত না করিয়াই লেখক জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে যে দৌত্যকার্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার মৌলিকতার কৃতিত্ব।''[৩]

অমিয়ভূষণের আগে এবং সমকালে আর কোনো ঔপন্যাসিককে উত্তরবঙ্গের কোনো অঞ্চল ও সেই অঞ্চলের মানুষকে এমন সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে উপন্যাসে রূপ দিতে দেখি না। অমিয়ভূষণ পূর্ববর্তী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরবর্তী অভিজিৎ সেন, সমরেশ মজুমদার, দেবেশ রায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা উত্তরবঙ্গের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের উপন্যাসে বিধৃত উত্তরবঙ্গের পটভূমি এবং পটভূমিতে চিত্রিত চরিত্রদের বাস্তবের চেয়ে বেশি কাল্পনিক মনে হয়। সেক্ষেত্রে অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে অনেক বেশি বাস্তবের কাছাকাছি রূপ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বেশকিছু উপন্যাসে রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক জনজীবনকে তুলে ধরেছেন। উত্তরবঙ্গের জনজীবন নিয়ে সেরকম উপন্যাস নেই বললেই হয়। অবশ্য উত্তরবঙ্গের অতীত ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকা দক্ষিণবঙ্গের থেকে অনেকটাই আলাদা। শুধু তাই নয় ভাষা

ব্যবহারেও দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের পার্থক্য চোখে পড়ে। অমিয়ভূষণ নিজেও উত্তরবঙ্গের অধিবাসী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ বিশ্বাসী অমিয়ভূষণ উত্তরবঙ্গের মানুষের সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে এই সমস্ত বঞ্চিত মানুষকে পরম সহানুভূতির সঙ্গে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রতি তৎকালীন সরকারের উদাসীনতা এবং বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরোধী ছিলেন অমিয়ভূষণ। তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। অমিয়ভূষণ মজুমদারের এই উপন্যাসগুলিতে আসাম সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, শালবাড়ি, জলপাইগুড়ি, জয়ন্তী ও বক্সা পাহাড় সহ তরাই ডুয়ার্সের বিস্তৃত অরণ্যময় অঞ্চলের চিত্র উঠে এসেছে। শুধু তাই নয় উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান নদী এবং তাদের অনেক শাখা নদীর গতিপ্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থান সহ উপন্যাসে উঠে এসেছে। যেমন— তিস্তা, তোর্ষা, ব্রহ্মপুত্র, রায়ডাক, কালজানি, সুটুঙ্গা, হলং, মানসাই, গদাধর প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গ নদীমাতৃক অঞ্চল, এই নদীগুলির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক জীবনধারার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর পূর্বে কোনো ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে যথাযথভাবে নদীবহুল এবং আরণ্যক উত্তরবঙ্গকে পটভূমি হিসেবে চিত্রিত হতে দেখা যায় না। অমিয়ভূষণের উক্ত উপন্যাসগুলিতে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট অঞ্চল এবং অঞ্চল ঘনিষ্ঠ জীবন চিত্রিত হওয়ায় উপন্যাসগুলিকে অনেকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে সেই ধারণা দূর হয়। কেননা, বিশেষ অঞ্চল পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের কোনো বৈশিষ্ট্য উক্ত উপন্যাসগুলিতে নেই বললেই চলে। তাছাড়া স্বয়ং অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর উপন্যাসকে বৃহত্তর পাঠক সমাজের সঙ্গে কমিউনিকেট করাতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি চরিত্রদের সরাসরি কোনো কার্যকলাপ অপেক্ষা অতীত স্মৃতি বা ভাবনার অনুষঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন। আবার ভাষার ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক ভাষাকে পুরোপুরি নয় কেবল তার আদলটুকু গ্রহণ করেছেন। পরিশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় উত্তরবঙ্গের বাস্তব অঞ্চলকে এবং স্থানীয় অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষগুলিকে যেভাবে অমিয়ভূষণ মজুমদার পরম মমতায় তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন এবং প্রকৃত শিল্পীর ন্যায় স্বকীয়তা দান করেছেন তা নিঃসন্দেহে সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্য নজির হয়ে থাকবে। অমিয়ভূষণের উক্ত উপন্যাসগুলি রচিত না হলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়, নদী ও

অরণ্যপ্রকৃতি এবং উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিম কৌম জনজাতির সমাজ-সংস্কৃতি এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের জীবনে ঘনিয়ে আসা সমস্যা ও সংকটকে এত নিবিড়ভাবে আমাদের জানা হতো না।

উল্লেখপঞ্জী:

১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ : সাহিত্যের ধারণা, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৭, পৃ. ৪১৬

২. মজুমদার, অমিয়ভূষণ : সোঁদাল, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, ৮ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৭৯

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা:লি:, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনমুর্দ্রণ: ২০০৬-২০০৭, পৃ. ৭৫৯